অপবিজ্ঞান

রাজশেখর বসু

(১৩৩৬/১৯২৯)

বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা হইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্ম সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যেসব ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য—বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযম আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ—এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্যের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচণ্ড বিদ্যুৎস্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন রূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল—'আরে না মশায়, আপনি জানেন না, চোঁ করে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন—'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।' এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্তলে, তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব ষ্টডধারুর উপযোগিতা আরও বেশী না হইবে কেন! বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন মায় প্রশংসাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস—মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন্ রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী—অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধুঁয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে—জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরস আছে, এবং ফসফরসের ধুঁয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা—ফসফরস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটাপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন চিরুনি চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটাপার্চা বলে। গাটাপার্চা রবারের ন্যায় বৃক্ষবিশেষের নির্যাস। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গাটাপার্চা বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা—সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল—'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাতা জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আরও একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে—'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ—রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার লেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে—complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত, অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য—তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু

তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসা বিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন—বাতাস করিতে গায়ে পাকা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চায়। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসা বিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায়, ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন—আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতণ্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন—পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ—যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই—কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম—কুইনিনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন—কুইনিন জ্বরকে জব্দ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন—জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুক প্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে—কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই প্রশ্ন থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলিবেন—জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য—জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে—অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে ; কারণ বলা হয়—পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation। এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা Law of Gravitation, মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে

কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান—অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাহাদের মধ্যে একটি ; জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণ নির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে—মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, *laws are not causes* যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়ত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে—অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপারপরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন—কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে—এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখণ্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা—অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ-ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুঁটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রতর্ক্য বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদণ্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক

নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কূট তর্কিক বলিবেন—প্রকৃতির অখণ্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকালে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন—তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ—অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ ; নিয়তির অর্থ—সমস্ত ঘটনার অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্‌বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোন পরিচিত হঠাৎ বড়লোক হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে—কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন—বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না! সমস্তই অদৃষ্ট, অপাল, ভাগ্য, নিয়তি। অমুক লোকটি মরিল কেন, ইহার উত্তরে যদি বলা হয়—কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স—তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা—মরণের অনির্ণেয়তা, বা অবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতূহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না। সুতরাং ইহাও বলা বৃথা—অমুক লোকটি ঘটনাপরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগূঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyinting-এর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।—

'No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Nature, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe.....A law of nature explains nothing—it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.